বিনয়কে

জ্যোতির্ময় দত্ত

১। ব্যক্তি

বিনয় মজুমদার-এর কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ষাটের দশকের শুরুতে কোনও এক লিটিল ম্যাগাজিনে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ফিরে এসো, চাকা'-র আড়াই পৃষ্ঠার এক রিভিউ-এ তিনটি কি চারটি উদ্ধৃতির বিদ্যুৎ চমকে।

'তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।'

যে-যার ভূমিতে দূরে-দূরে আমরা সকলেই। শুধু বৃক্ষ নয়। বিনয় মজুমদারের কবিতার বিষয় সেই ব্যবধান, বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতাবোধ ও মিলনেচ্ছা যা ফরাসী দার্শনিক পাস্কালের একটি সূক্তে আছে :

'আমি অনন্ত মহাকাশের কথা ভাবি, এবং ভয় পাই সেই সব অসীম
বিস্তারের ধারণায় যেখানে আমার অস্তিত্বের ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই।'

শক্তির রিভিউ পড়ে, মাটিতে বন্দী বিচ্ছিন্ন গাছের মতো, আমারও বিনয়কে দেখার শ্বাসরোধী কথা মনে এল। কবিতার এমনই ক্ষমতা! কত দূর-দূর থেকে ভেসে আসা পংক্তির শিমুল তুলো বীজিত করে বন্দী, নির্বাসিত মন!

তখন আমার নির্বাসন ইংরিজি দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর নিউজ ডেস্কে। বিকেলে, পেয়াদাদের বাধা অগ্রাহ্য করে, মলিন গিল্ট দেওয়া পাৎলুন ও ঢোলা, ছেঁড়া জামায় আমার সামনে এক বিস্ময়কর মূর্তি হাজির। এই নেটিভ সমুদ্রে তখনও স্টেটসম্যান এক সাজানো-গোছানো শ্বেতাঙ্গ দ্বীপ। তার মধ্যে তো বটেই, কিন্তু এই ধুলোর কলকাতার পথেও, বস্তুত পৃথিবীর সর্বত্রই, ওই মূর্তি বেমানান। কাপড়জামা পাগলের কি ভিখিরির, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেবদূতের। আর আগন্তুকের হাসি?

'মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে।'

তথাকথিত মানসিক বৈকল্যের মেঘ বিনয়ের মাউন্ট পালোমার-এর দূরবীনের চেয়েও ক্ষমতাশালী চৈতন্যের আয়নাকে অধিকাংশ সময় ঝাপসা করে রাখে। সেই মেঘ চিরে এক ফালি আলো ওই বিকেলে হেসেছিল।

'শুনলুম, আপনি আমাকে খুঁজছেন? আমি বিনয় মজুমদার।'

আমি ডেস্ক ছেড়ে উঠে, তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম।

ততদিনে আমি এক কপি 'ফিরে এসো, চাকা' সংগ্রহ করেছি। তাতে ৮ই মার্চ, ১৯৬০, থেকে ২৯শে জুন, ১৯৬২-এর মধ্যে—কোনও ঘুমন্ত গিরির তিন-চারবার অগ্ন্যুৎপাতের মতো—কয়েকটি অবিশ্বাস্য-ঝলকে লেখা ৭৭টি কবিতা আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। এই মহাকবি সশরীরে আমার কারাগারের গরাদ ঝাঁকা দিলেন। কাজে তুড়ি মেরে,

মেঘের উপর ভাসতে-ভাসতে, সেকালের চৌরঙ্গী রেস্তরাঁয় পৌঁছলাম। মনের ভোজ তো হলই, কাটলেট-চপ-চা ইত্যাদিও চলল।

তারপর থেকে বিনয়ের জীবনের সুতোর সঙ্গে আমার সুতোর কখনও গিঁট বেঁধেছে, কখনও গেছে ছিঁড়ে, কখনও তাঁতের মাকুর মতো ঘটনার এপাশ-ওপাশ আমাদের একেবারে একসঙ্গে বুনে দিয়েছে, কখনও সমুদ্রের ঝড়ে পালের মতো ফ্যাঁশ করে দিয়েছে ছিঁড়ে। এটা খুব স্বাভাবিক যে কখনও-কখনও বিনয় আমাকে তাঁর শত্রু মনে করতেন, বিশেষত যখন তাঁকে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতুম। প্যারানইয়া যখন তাঁকে অধিকার করত, তিনি আমাকে তাঁর কবিতা ও গণিত চুরি করে বিদেশে পাচারের অভিযোগে অভিযুক্তও করেছেন। যখন আমাদের ব্রড স্ট্রিটের বাড়িতে তিনি থাকতেন, আমার সর্বংসহা দুই আশ্রয়কে—মা ঊষা এবং স্ত্রী মীনাক্ষীকে—তিনি এমন উৎপাত করেছেন যে তাঁরা বিনয়ের প্রতি শুধু নয়, আমার প্রতিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তবু, তাঁরা ক্ষমা শুধু করেননি, সেবাও করেছেন। কে না কত করেছেন! অমিয় দেব তাঁর ছাদের ফ্ল্যাটে দিয়েছেন মাসের পর মাস আশ্রয়। তিনি ও সুবীর রায়চৌধুরী তাঁর ভর্তি ও দেখাশোনা করেছেন সরকারপুল হাসপাতালে। লুম্বিনীতে তাঁর চিকিৎসায় সাহায্য করেছেন সত্ততুল্য ডঃ মৃণাল বড়ুয়া, যাঁর নিজের কাহিনী কোনও বোধিসত্ত্ব জাতকের হতে পারত। গোপনে কখনও-কখনও বিনয়ের ব্যয়ভার বহনে অর্থসাহায্য করেছেন সমর সেন। এইসব লিখছি কারণ, যদিও কবিতার কথা এটা নয়, এটা জীবনের বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্বের প্রমাণ। বিনয়ের নিজের ভাইয়েরা যেমন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন ঠাকুরনগরের গাঁয়ের মানুষ।

আমাদের সমাজ বড় এলোমেলো, এমন কোনও সংগঠন কি প্রতিষ্ঠান নেই যে একজন প্রতিভাবান অসহায়ের ভার নেবে। ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টায় কয়েকটি সঙ্কট কাটানো গিয়েছিল বটে কিন্তু যদি যত্ন, সাহচর্য ও সৌন্দর্য দিয়ে তাঁর সারাটা সৃজনশীল জীবন ঘিরে রাখা যেত তবে শুধু বাংলা ভাষাই নয়, মানবসভ্যতাই উপকৃত হতো। কারণ বিনয় মজুমদার অনন্য। আমরা বাস করি সমতলে, আমাদের জন্য ইউক্লিড, বিনয়ের জ্যামিতি আলাদা। তা পঞ্চমাত্রিক। তাঁর গণিতের কিছু বোঝার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু যেমন রামানুজের বেলায় এখন হচ্ছে, কে জানে, ২১ শতকের কোনও বিচক্ষণ কম্পিউটার বিনয় মজুমদারের সলিউশন ও সিকোয়েন্স পরম্পরার শুদ্ধতা অক্লেশে করে দেবে না প্রমাণ? আমি কেবল তাঁর কবিতার কিছু-কিছু বুঝেছি। আমার বিচারে তাঁর স্থান কোথায় তা বোঝাবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আমেরিকায় প্রবাসকালে এশিয়া সোসাইটির তৎকালীন প্রকাশন-প্রধান শ্রীমতী বনি ক্রাউন আমার কবিতার একটি ইংরিজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করেন। আমি হেসে ফেলেছিলুম। বলেছিলাম, যে কবিতা লেখার জন্য আমার জন্ম, যা জগৎকে দেখানোর একটুও ইচ্ছে আমার হতে পারে, তার প্রথম পংক্তিও এখনও আমি লিখিনি। কিন্তু যাঁর কবিতার সঙ্গে ইংরিজির মধ্য দিয়ে মানবজাতির পরিচয় ঘটানো আমার স্বপ্ন তাঁর

নাম বিনয় মজুমদার। এশিয়া সোসাইটির বৃত্তি পেয়ে আমি বিনয়ের ৪০টি কবিতার অনুবাদ করেছিলাম যার কিছু-কিছু ট্রাইকোয়ার্টার্লি, হাডসন রিভিউ, ইত্যাদি বিখ্যাত কাগজে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু কর্ণাটকি নৌকো কিংবা মরিচঝাঁপির মতোই, 'কাম ব্যাক, ও হ্ইল' বইটিও ছিল অভিশপ্ত।

মাঝদরিয়ায় নৌকোডুবির জন্য কুখ্যাত জ্যোতির্ময় দত্তের ট্র্যাক-রেকর্ড ছিল প্রকাশক সংস্থাটির অজানা, তাই সোৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি যে অভাগা মার্কিন পাবলিশায় মনোনয়ন করেন, সেই সংস্থাই উঠে যায়, এবং শ্রীমতী ক্রাউন কিছুতেই আর ম্যানুস্ক্রিপ্ট উদ্ধার করতে পারেননি। কিন্তু ওই অক্ষম ভাষান্তরেও বিনয়ের কবিত্ব কতটা প্রভাব ফেলেছিল তার একটা হৃদয়বিদারক প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতায় যে ভারতীয় যুবক ছিল ইংরিজি ভাষার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লেখক, যার গায়ের রঙ ছিল খরমুজের ভেতরটার মতো আর যার অন্তর ছিল স্বপ্নময় ও বিশুদ্ধ, কিছুটা শেলি আর কিছুটা বিবেকানন্দ, যার জন্ম টোকিয়োতে এবং শিক্ষা কেম্ব্রিজে, সেই ধীরেন ভণ্ড বিনয়ের অনুবাদ পড়ে, বিলেত থেকে কলকাতায় এসে খুজে-খুজে বার করেছিল আমাকে, এবং পুজোয় বাঙালি-সাজে প্রতিমা দর্শনের অভিলাষে কিনেছিল পাঞ্জাবি এবং ধুতি। ঋষি কি দেববালকের রূপে ও পবিত্রতায় লজ্জা দেওয়া ধীরেন দিল্লিতে ইংলন্ডের বিখ্যাত এক কাগজের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল, এবং জীবনরসে উপচে আমাদের পুরো পরিবারকে নিমন্ত্রণ করেছিল বড়দিনের ছুটিতে রাজধানীতে। নতুন গাড়ি কিনেছে। বাড়িটা লোদি গার্ডেনের পাশেই। দিল্লির আবহাওয়া তখন নাকি ইতালির বসন্ত। কয়েকদিন পরেই কাগজে দেখলাম, এক ইস্পাতের বর্গাবোঝাই লরির সঙ্গে তার গাড়ির ধাক্কায়, এই ধুলোর পৃথিবীতে তার মেয়াদ কাটিয়ে ধীরেন সুরলোকে ফিরে গেছে। ধীরেনের বাবা-মা এখন কোথায় জানি না। কিন্তু সেই থেকে তার জন্য আমার ব্যথা ও শূন্যতাবোধ জানাবার বাহন খুজছিলাম। ব্যবধান ও ইন্দ্রিয়াতীত সম্পর্কস্থাপনের কবি বিনয় মজুমদারকে উদ্দীপ্ত এই শব্দস্তবকে ধীরেনের জন্য একটি ঘাসফুল গুজে দিলাম।

২। কবিতা : প্রথম পর্ব

ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে বিচ্ছেদ—এটা তো সব আধুনিক শিল্পেরই মর্মকথা। তাহলে বিনয় অন্য কবিদের থেকে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন এই বিচ্ছেদবোধের তীব্রতায়। ভিন্ন তাঁর চিত্রকল্পে। 'ফিরে এসো, চাকা' বাহ্যত একজন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বিচ্ছেদের কবিতা। 'চাকা' হচ্ছে 'চক্রবর্তীর' অপভ্রংশ। এই কবিতামালা গায়ত্রী চক্রবর্তী নামের এক রক্ত-মাংসের সত্তার উদ্দেশ্যে রচিত বলে কবি একদা দাবি করতেন। কিন্তু পরে অন্য নামও উৎসর্গে ব্যবহার করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত, বিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে কার সঙ্গে তা গ্রন্থের পরিবর্তিত নামেই স্বচ্ছ : 'ঈশ্বরীর' জন্য।

জর্মান কবি, নাট্যকার ও ভাবুক শিলার তাঁর এক বিখ্যাত রচনায় প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের পৃথক লক্ষণরূপে ব্যক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে এই ছেদ, এই ব্যবধান, এই

বিরুদ্ধতাকেই নির্দেশ করেছিলেন। সভ্যতার ছেলেবেলায়—হোমার কি বাল্মীকির কালে—মানুষ প্রকৃতির কোলে শুয়ে, তাঁর স্তনবৃন্তে মুখ রেখে—অচ্ছেদ পান করেছে সুধা। সেই অপাপবিদ্ধ যুগের শিল্পকে শিলার আখ্যা দিয়েছিলেন 'নাইভ'—'সরল'। পরবর্তী যুগের শিল্প 'সেন্টিমেন্টাল' অনুভূতিময় ও অভিমানাহত। 'ব্যক্তি' হওয়া মানেই জননীর সঙ্গে নাড়িচ্ছেদ। আধুনিক মানুষ প্রকৃতির ক্রোড় থেকে বহিষ্কৃত। আগে প্রত্যেক ঝর্ণা, পর্বত, নক্ষত্র মানুষের সঙ্গে কথা বলত। সহবাস করত। এখন তারা দূর, হৃদয়হীন, বিজাতীয়।

'জরায়ু ত্যাগের পর বিস্তীর্ণ আলোকে এসে শিশু
সৃষ্টির সদর্থ বোঝে, নিজস্ব পিপাসা, ক্ষুধা পায়।
অন্ধকার সীমা ছেড়ে চেয়ে দ্যাখে, আরও পরিসীমা
আকাশের নীলে, চাঁদে, নক্ষত্রের আহ্বানে নিহিত।'

এই বিচ্ছেদবোধ ক্রমে তীব্র হতে-হতে কখনও উথলে উঠেছে বিলাপে, কখনও পরিণত হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বে কি ঘৃণায়। শিবনারায়ণ রায় এই আধুনিক বিচ্ছেদানুভূতির নাম দিয়েছেন 'পারকা'। ইংরিজিতে যাকে বলি 'অ্যালিয়েনেশন'। 'আমি' হচ্ছি একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। বাকি সব কিছু হচ্ছে 'অপর'। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যেই আমাদের সকল কান্না। কিন্তু ওই 'অপর' শেষ পর্যন্ত অপ্রবেশ্য, অজ্ঞেয়, মানবের সব আকুতিমিনতিতে প্রতিক্রিয়াহীন। বের্টল্ট ব্রেশ্ট-এর কবিতায় তাই বারংবার প্রার্থনা কি বিলাপের প্রতিরূপ। সৌরলোক, ছায়াপথ, দ্বীপ—ব্রহ্মাণ্ডের পর দ্বীপ—ব্রহ্মাণ্ড পার হয়ে যাক ভয়েজারের চেয়ে কোটিগুণ শক্তিমান মহাকাশ যান, কোথাও পাবে না আমাদের এত ব্যাকুল প্রার্থনার উদ্দীপ্ত পরম স্নেহময় ঈশ্বরের, কিংবা বিনয়ের 'ঈশ্বরী'র দর্শন, এই 'ঈশ্বরী' কখনও প্রেমিক, কখনও মাতা, যে তাঁকে 'অবৈধ সন্তানের মত' ফেলে গেছে পথে।

'কী বিস্মিত বেদনায় একা-একা কেঁদে ফেরে শিশু।
অজীর্ণ, তোমাকে নিয়ে আর কতো গান গাওয়া হবে?
এতোকাল চলে গেলো, তবু মাঝে-মাঝে বাতায়ন
খুলে দেখি, মহাশূন্যে গোয়েন্দার মতো জোনাকিরা
জ্বলে নেভে, জ্বলে নেভে তৃষ্ণা নিয়ে এরূপ খেলায়
কতোকাল চলে গেলো; মরণের মতো ক্লান্তি আসে।'

আধুনিক কবিতা এই অজীর্ণের, প্লীহার গান। বিনয় 'মরণের মতো ক্লান্তি'কে জয়ের চেষ্টায় শেষের দিকের কবিতায় যা করেছেন তা, আমার উপলব্ধিতে, পয়ারবদ্ধ স্বদেহন, নয়তো সৃষ্টির সঙ্গে একত্বের হার্দিক প্রয়োজনের কাছে যুক্তির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। কিন্তু বিনয়ের প্রথম পর্বের কবিতায় সংশয় ও বিশ্বাসের, নাস্তি ও অস্তির মধ্যে তুলার কাঁটা এ-মেরু ও-মেরু করে। অপর 'তুমি' কি বাস্তব? হয়ত তোমাকে না-দেখতে পাওয়াই তোমার সান্নিধ্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ? কিংবা তোমাকে পুরোটা পাচ্ছি না,

তা নৈরাজ্য কি বেনিয়ম কিছু নয়, তা বিশ্বনিয়মেরই অধীন কোনও মহাজাগতিক ঘটনা! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মন ভালো নেই' বইয়ের একটি কবিতায় শিবনারায়ণ চিহ্নিত ঐ পারক্যবোধ যথেষ্ট আছে, কিন্তু কবি তা হালকা জলরঙে এঁকেছেন, বিনয়ের যেখানে ভাষা জ্যামিতিক। সুনীল 'ক্ষণিকের কৌতুক' পানে তৃষ্ণ, বিনয়ের 'মরণের মতো তৃষ্ণা'। সুনীলের 'বাসনা আমার' কবিতার শেষ আট লাইন :

'আমি কেউ নই সম্মিলিত এ সুরে
যারা কাছে ছিল তারা আজ বহু দূরে
টেলিপ্রিন্টারে ছিন্নভিন্ন পৃথিবী
সকলেই বলে কী দিবি, কী দিবি, কী দিবি ?
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তুমি কি এখনো নিরালায় ভালোবাসো না
পান করে যেতে ক্ষণিকের কৌতুক ?
সাথী কেউ নেই ? আয়নায় কার মুখ ?'

সুনীলের ছন্দের মন্দিরায় আমরা মোহিত। কিন্তু বিনয়ের চিত্রকল্প উপমা নয়, তা যেন বিজ্ঞান। নিচের কবিতায় একটিও লাইন নেই যাতে শিল্পের সেই সব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে যার—মাদকপ্রভাবে আমরা অসতর্ক হয়ে যাই, অলীক জেনেও কবির অভিপ্রেত স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিই। সমালোচকেরা যাকে বলেন 'মোমেন্টারি সাসপেনশন অফ ডিজবিলিফ' তার যেন কোনই প্রয়োজন নেই এই কলাবিজ্ঞান ও গণিত-সাধকের। এটা প্রেমের কবিতা? না তীব্র ধর্মবিশ্বাসের? এটা কি ধাপ-ধাপ যুক্তির পাথর বসানো অটল পিরামিড? নাকি কয়েকটি বরফের কিউব—যা একটু চিন্তার তাপেই গলে যাবে? এখানে উপস্থিতি লুকোচুরি খেলছে অনুপস্থিতির সঙ্গে। তুমি নেই? তুমি কি তেমনই নেই 'অগণন কুসুমের দেশে' যেমন নেই নীল গোলাপ? কিন্তু এই না-থাকাটা হয়ত তোমার থাকারই প্রমাণ? এমনকি চন্দ্র-সূর্য'ও তো কখনও-কখনও মনে হয় নেই। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়। যা দিয়ে আমরা এত রঙ দেখি, সেই নিজের চোখের মণির তো রঙ আমরা দেখি না? তোমার অনুপস্থিতিই তোমার নৈকট্যের প্রমাণ। মাত্র ১০টি লাইন, কিন্তু বৃত্তসংহার কাব্যের চেয়ে দীর্ঘ এর রেশ, এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কিংবা 'যেতে নাহি দিব' কবিতার চেয়েও বিস্তার এর বেশী।

'আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী
বাষ্পের সহিত বাতাসের মতো নাই মেশো,
সেও এক অভিজ্ঞতা, অগণন কুসুমের দেশে
নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো
তোমার অভাব বুঝি ; কে জানে হয়তো অবশেষে
বিগলিত হতে পারো ; আশ্চর্য দর্শন বহু আছে—

নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও
হয়তো পাই না আমি, পূর্ণিমার তিথিতেও দেখি
অস্ফুট লজ্জায় ম্লান ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে থাকে,
গ্রহণ হবার ফলে, এরূপ-দর্শন বহু আছে।'

আগেই বলেছি 'ফিরে এসো, চাকা' একটি শান্ত সবুজ পাহাড়ের চূড়া উড়ে যাওয়ার মতো আকস্মিক বলে প্রথমে মনে হয়। এবং কবি নিজেই জানিয়েছেন যে এই ভূগর্ভের অগ্নি-উৎক্ষেপণের কারণ 'প্রত্যাখ্যাত প্রেম'।

'প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে-আত্মলীন।
অগ্নি উদ্গমন করে এ-গহ্বর ধীরে-ধীরে তার
চারিদিকে বর্তমান পর্বতের প্রাচীর তুলেছে।
এতো উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন শঠতা,
যাতে সমতলবর্তী প্রজাপতি, পাখিদের রঙ
তার কাছে নিরর্থক ; এমন সমস্যা কী আমি।
দূরে যাও মেঘমালা, তোমাদের দৌত্যে, আলিঙ্গনে
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না!
আমি যাবো দেশান্তরে যেখানে ফুলের মুক্তি আছে।
বৃষ্টি, ঢেউ, ত্যাগ করে রসে পুষ্ট শিল্প পেতে পারি
বর্তমানে, চারিপাশে পর্বতের প্রাচীর আসীন।
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না।'

প্রেমে তো অনেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু 'অসহ ধিক্কারে' অন্য কেউ তো এরকম ঝলকে-ঝলকে কবিতা উৎক্ষেপণ করেন না? রবীন্দ্রনাথের ধাপে-ধাপে বিবর্তন আমরা দেখতে পাই। 'যে আঁধার আলোর অধিক' এ পৌঁছতে বুদ্ধদেব বসুকে দ্রৌপদীর শাড়ি-র কত না ভাঁজ খুলতে হয়েছে, ভাঙতে হয়েছে কবিতার কত ঘোরানো সিঁড়ির ধাপ! এমনকি জীবনানন্দেরও গেছে নজরুল-মোহিতলাল পর্ব। কিন্তু বিনয় মজুমদারের যেন কোনও প্রস্তুতি নেই! 'ফিরে এসো, চাকা' যেন মহাকাশ থেকে পড়া— বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত—একটি উল্কাখণ্ড। প্রথম কবিতার প্রথম লাইনেই বিনয় তাঁর নিজস্ব ভাষা, সুরে, ছবির মালিক :

'একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো—এই স্মিতদৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হ'লো ফল।...'

এটার তারিখ ৮ মার্চ ১৯৬০। পরেরটি ২৬শে আগস্ট। দ্বিতীয় কবিতার শেষ ৭ লাইন :

'সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কতো বেশী বিপদসঙ্কুল
তারো বেশী বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ,
এ সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে ব'লে।
তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু,
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।'

তৃতীয় লেখাটি হল ২৬ দিন পর—২১শে সেপ্টেম্বর। পরেরটা ১১ই অক্টোবর। ১৪ই অক্টোবর। ১৫ই অক্টোবর। সময়ের ব্যবধান কমে আসছে। তাল-লয় দ্রুম দ্রুত হচ্ছে। তারপর, অকস্মাৎ বিরতি। নয় মাসের। 'ফিরে এসো, চাকা'-র অষ্টম কবিতার তারিখ ১৫ই জুন, ১৯৬১। এই পর্বে কোনও-কোনও দিন—যেমন ২৬ ও ২৭ শে জুন—দু-দুটি কবিতা বিনয়ের ফার্নেস থেকে বেরিয়ে এসেছে, একেবারে নিখাদ, বুদবুদ কি ভস্ম নেই, যেন শিল্প নয়, নগ্ন প্রকৃতি। প্রত্যেকটি কবিতা যেন 'রচিত' নয়, তা সমুদ্রের তল থেকে ঢেউয়ের আবর্তে তটে ফেলে যাওয়া। কিন্তু, যদিও 'সকলপ্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া' মানুষের স্বভাব, সকলের জ্বরতপ্ত মাথা এক প্রক্রিয়ায় চলে না। বিনয়ের মাথার ভেতরের সফটওয়্যার কী ছিল তখন? সফটওয়্যারটা বাংলা কবিতা, যার মেমারিতে স্পষ্টতই জীবনানন্দের পুরোটা ঠাশা। কিন্তু সার্কিট্রি? সেটা বিজ্ঞানের। প্রথম দিকের কবিতায় দুটি স্তর আলাদা করা যায়। যেমন নিচের আট লাইনে প্রথম তিন এবং শেষ পংক্তির লেখক বি. ই. কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিঙে ফার্স্ট ক্লাস, ৪,৫ ও ৬ লাইন বিলকুল জীবনানন্দ; আর সপ্তম লাইন নির্ভেজাল বিনয় মজুমদার।

'তাঁবুর ভিতরে শুয়ে অন্ধকার আকাশের বিস্তার দেখেছি,
জেনেছি নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে
সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন, আলোহীন গ্রহ।
আমিও হতাশাবোধে, অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শুয়েছি একা—কীটদষ্ট নষ্ট খোসা শাঁস।
হে ধিক্কার, আত্মঘৃণা, দ্যাখো কী মলিনবর্ণ ফল।
কিছুকাল আগে প্রাণে, ধাতুখণ্ডে স্নানির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিল।
আলোকসম্পাতহেতু বিদ্যুৎসঞ্চার হয়, বিশেষ ধাতুতে হয়ে থাকে।'

সব শিল্পেই রেওয়াজ লাগে। পিয়ানোতে আঙুল খুলতে কারও লাগে বহু বছর, কারও বা মাস! বিনয়ের ক্ষেত্রে লেগেছিল নয় মাস। ২৭শে জুন ১৯৬১ বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। সেদিন যে-দুটি কবিতা বিনয় লিখেছিলেন, তার একটি থেকে :

'অমল প্রত্যূষে
ঘুম ভেঙে দেখা যায়, আমাদের মুখের ভিতরে
স্বাদ ছিলো, তৃপ্তি ছিলো যেসব আহার্য তারা পচে
ইতিহাস সৃষ্টি করে ; সুখ ক্রমে ব্যথা হয়ে ওঠে।

পাঁচদিন পরে, ১লা জুলাই, তিনি আরোহণ করলেন বাংলা কবিতার এক শিখরে :

'সময়ে ভেবেছিলাম সম্মিলিত চায়ের ভাবনা,
বায়ুসেবনের কথা, চিরন্তন শিখরের বায়ু।
দৃষ্টি বিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব'লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়ত লুপ্ত, মৃত।
অথবা করেছো ত্যাগ, অবৈধ পুত্রের মতো, পথে
জীবনের কথা ভাবি, ক্ষত সেরে গেলে পরে ত্বকে
পুনরায় কেশোদ্গম হবে না, বিমর্ষ ভাবনায়
রাত্রির মাছির মতো শান্ত হয়ে রয়েছে বেদনা—
হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে।
মাঝে-মাঝে অগোচরে বালকের ঘুমের ভিতরে
প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝরে যাবে।'

৩। কবিতা : পরবর্তী পর্ব

ব্যাখ্যা করে এরকম বহু-স্তর, বহু-মাত্রিক কবিতায় অনুপ্রবেশ করার রোমাঞ্চ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করব না, তবে এটা উল্লেখ না-করে পারছিনা যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর যেমন পুরুষ, তার আখ্যা স্বামী, কি রাজার দুলাল, কি জীবনদেবতা, বিনয়ের ক্ষেত্রে সেই স্থান নারীর—প্রেমিকা, জননী, ঈশ্বরী। রবীন্দ্রনাথের মতো, তাঁরও প্রেম ও পূজায় মেশামেশি। প্রভেদ, রবীন্দ্রনাথের মিলনেচ্ছা যখন রথের চাকার ধুলো ও ফুলের গন্ধে মেশা, বিনয়ের পরবর্তী রচনা প্রায় তন্ত্রসাধকের মতো, তা কামুকের, এবং কোনও-কোনও কবিতা স্রেফ পর্নোগ্রাফি বলে মনে হতে পারে। যেমন 'চাঁদ' সিরিজ। সঙ্গমের ব্লো-বাই-ব্লো অ্যাকাউন্ট। এগুলি কবিতা ? না পর্নোগ্রাফি ? বিনয়ের পুরো মানসিক মানচিত্রের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, এটা নির্ভেজাল 'পর্নো' বলে ভ্রম হতে পারে। সন্দেহ জাগতে পারে, কবিতায় স্থায়ী রোমাঞ্চ নয়, এটা কেবল করে সাময়িক যৌন উত্তেজনার সঞ্চার।

'চাঁদের গুহার দিকে

চাঁদের গুহার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকি, মেঝের উপরে
দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁদ, প্রকাশ্য দিনের বেলা, স্পষ্ট দেখা যায়
চাঁদের গুহার দিকে চেয়ে থাকি, ঘাসগুলি ছোটো করে ছাঁটা।
ঘাসের ভিতর দিয়ে দেখা যায় গুহার উপরকার ভাঁজ।

গুহার লুকানো মুখ থেকে শুরু হয়ে সেই ভাঁজটি এসেছে
বাইরে পেটের দিকে। চাঁদ হেঁটে এসে যেই বিছানার উপরে দাঁড়ালো
অমনি চাঁদকে বলি, 'তেল লাগাবে না আজ' শুনে চাঁদ বলে
'মাখব নিশ্চয়, তবে একটু অপেক্ষা করো' বলে সে অয়েল ক্লথ নিয়ে
পেতে দিল বিছানায়, বালিশের কিছু নিচে, তারপর হেঁটে চলে গেলো…'

এটি স্পষ্টতই কোনও 'বাস্তব' অভিজ্ঞতার বর্ণনা—যদিও নারীটিকে বিনয় 'চাঁদ' রূপে অভিহিত করেছেন ('ফিরে এসো, চাকা'-য় জ্যোৎস্না হচ্ছে প্রেমের প্রতীক)। অয়েল ক্লথ, তাক, বাঁ হাতে তেল—এগুলি হচ্ছে বাস্তবের অনুপুঙ্খ, চিত্রকল্প নয়। অ্যালেন গিন্সবার্গের 'পাগল' সঙ্গী, পিটার অলোভস্কিকেও, এইভাবে দেখেছি নিউইয়র্কে, ওই অঞ্চলের নারীদের দ্বারা ষাঁড় হিসেবে ব্যবহৃত হতে। 'পাগল'দের সঙ্গে সঙ্গমে সামাজিক দায়িত্ব নেই—একটা বিপদ ছাড়া। বিনয়ের মস্তিষ্কের হার্ডওয়ার পয়ারে বাঁধা, যে-কোনও সফটওয়ার, যে-কোনও অভিজ্ঞতাই ৮।৬।৪ কিংবা ততোধিক মাত্রায় প্রসেস করে তা বার করে দেয়। কিন্তু এগুলি কি কবিতা? জানি না। কিন্তু এটাও জানা দরকার, প্রকাশের যোগ্য শুধু নয়, বিশেষভাবে পঠিতব্য ও আলোচিতব্য। যে-কবি ওই চিরন্তন শিথরের বায়ু সেবন করেছেন, তিনি কেন কোনও এক বা একাধিক গ্রাম্য নারীর ধর্মের ষাঁড়ের ভূমিকা পালন করবেন? কেন নয়? কেউ কি সৃষ্টির রহস্যে মেত্রর চেয়ে শক্তিশালী কোনো প্রবেশিকা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এখানে 'ধর্মের' শব্দটি সচেতনভাবে চয়িত। শিমুলপুরের আগাছা ও জঙ্গলে ঘেরা নির্জন বাড়িতে কখনও পুকুরের নিশ্চুপ বকের মতো একপায়ে ধ্যানস্থ, কখনও কাঠঠোকরার মতো মাথা ঠুকছেন, কখনও বিড়বিড় করছেন ফুলের দিকে তাকিয়ে যে সমাজ-পরিত্যক্ত মানুষ, তিনি ঈশ্বরীর সঙ্গে এইভাবেই যোগ খুঁজছেন। একবার 'ধাতুখণ্ডে যে সুনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিল' তাই আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে 'চাঁদ'।

'পৃথিবী, ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখী—সবার জীবনী লেখা হলে,
আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চলে যেতো বেশ।
আমার ব্যথা, প্রস্তাব, প্রয়াস তবু সবই লিপিবদ্ধ থেকে যেতো।
তার মানে মানুষের, বস্তুদের, প্রাণীদের জীবন প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক
অসংখ্য জীবন নয়, সব একত্রিত হয়ে একটি জীবন মোটে…'

এটা কি পাগলের ভ্রান্তি? নাকি পাস্কালের হাহাকারের উত্তর? হয়ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই 'একটি জীবন মোটে'? এই সমুদ্র-মেঘ ঘেরা, উদ্ভিদ-কীট-স্তন্যপায়ী প্রাণীময় পৃথিবী যে সামগ্রিক সত্তার শরীরে একটি কোষাণুকোষ মাত্র? যেমন রক্তের কোটি-কোটি শ্বেতকণিকার কাছে আমাদের শরীর একটি বিশাল জগৎ, বহির্বিশ্ব থেকে হানাদার এলে যাদের প্রতিহত করতে শ্বেতকণিকা বাহিনী সসস্ত্র অগ্রসর হয়। আমার শ্বেতকণিকাগুলি কি জানে আমি কে? আমার মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক কণাগুলির নিক্ষেপ সেই সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করে যাকে আমি বলি 'চিন্তা', 'বার্তা', 'ভালোবাসা',

'ঈশ্বরানুভূতি', 'কাম' - সেই কণাগুলির কি আমার বিষয়ে আছে কোনও সম্যক বোধ কি ধারণা ?

বিনয়ের প্রতিপাদ্য সারবান ; এক্কেবারে হালের কণাবিজ্ঞান থেকে শুরু করে উপনিষদে আছে তার সমর্থন। আমার আক্ষেপ শুধু যে বিনয়ের কবিতায় নেই আর সেই বিদ্যুৎগর্ভ উপমা-মেঘের চমকানি। তা নিরস বর্ণনা কি ঘোষণামাত্র। নেই সেই কবিত্বের ডায়নামো-উৎপাদিত বিদ্যুৎ যার দ্বারা ঠাণ্ডা অ্যালুমিনিয়মের কেবল পরিণত হয় হাজার ভোল্টের লাইভ ওয়্যারে। বিনয়ের কবিতার পংক্তি এখন মৃত লাইন—যাকে কোনওমতে টানটান ধরে রেখেছে পয়ারের পাইলন। □